গো-খাদ্য হিসেবে ইপিল ইপিলের চাষ ও ব্যবহার

ভূমিকা

ইপিল ইপিল হলো ডাল জাতীয় উদ্ভিদ। এর পাতাগুলো দেখতে ঠিক তেঁতুল গাছের পাতার মতো। এটি Leguminosae পরিবার এবং, Mimosoideae উপ-পরিবারভুক্ত । এই পরিবার ও উপ-পরিবারে সব মিলিয়ে মোট ১৮,০০০ প্রজাতির উদ্ভিদ বিদ্যমান। উদ্ভিদ বিজ্ঞানে ইপিল ইপিল Leucaena leucocephala (Lam) dewit নামে পরিচিত। সব প্রজাতির ইপিল ইপিল উদ্ভিদকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় ঃ

সাধারণ (হাইওয়ান শ্রেণী)

আকারে ছোট, ঘন ঝোঁপে পূর্ণ। উচ্চতা ৩-৮ মিটার পর্যন্ত। এরা ৩-৬ মাসের মধ্যে ফল দেয় এবং সারা বছরই ফল হয়। ফুল থেকে প্রচুর বীজ পাওয়া যায়। পশু খাদ্য হিসেবে উক্ত জাতের ইপিল ইপিল খুবই উপযোগী। বন্যার ক্ষতির হাত থেকে রক্ষার্থে বড় রাস্তার দুই পাশে, বাড়ির আংগিনায় ও বনায়নে হাইওয়ান বেশ উপযোগী।

মধ্যাকৃতি (পেরু শ্রেণী)

উচ্চতা ৫-১২ মিটার পর্যন্ত হয়। অনেক শাখা-প্রশাখা ও ঝোঁপে পরিপূর্ণ। গো-খাদ্য হিসেবে বেশ উন্নতমানের। চা বাগানে, রাস্তার পাশে বা বাড়ির আঙিনায় রোপণ করা যেতে পারে।

বৃহদাকার (সালভাদর শ্রেণী)

আকারে লম্বা, শাখা-প্রশাখা বেশ বিস্তৃত। উচ্চতা ২০ মিটার পর্যন্ত। যে সব গাছ ছায়ায় হয়

তাদেরকে ছায়া দেয়ার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন-চা বাগান, পানের বাগান ইত্যাদি। তাছাড়া সবুজ পাতা ও ডগা উৎকৃষ্ট গো-খাদ্য হিসেবে পরিচিত।

উৎপত্তি ও বিস্তৃতি

যতদূর জানা যায়, ইপিল ইপিলের উৎপত্তি সেন্ট্রাল আমেরিকায় এবং মেক্সিকোতে। সেখান থেকে তারা নিচু এবং শুকনো এলাকায় বিস্তার লাভ করে। গুণাগুণ বিচারে কম বেশি সব দেশেই ইপিল ইপিল জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে চারা গাছ জমিতে ১×১ মিটার ফাঁকে ফাঁকে লাগানো যেতে পারে। বছরের অন্য সময় লাগালে পর্যাপ্ত পানি দিতে হবে। এ ছাড়া জমিতে সরাসরি বীজ বপন করা যেতে পারে। প্রতি হেক্টরে২০-২৫ কেজি বীজ প্রয়োজন। কিন্তু লাইনে লাগালে প্রতি হেক্টরে ১০-২০ কেজি বীজই যথেষ্ট।

আবহাওয়া

ইপিল ইপিল গ্রীষ্মমন্ডলীয় উদ্ভিদ। গরমে দ্রুত বৃদ্ধি পায় কিন্তু শীতে এদের বৃদ্ধি কমে যায়। সারা বছর গড়ে ৬০০ থেকে ১৭০০ মিলি লিটার বৃষ্টিপাতে উন্নত ফলন পাওয়া যায়। এছাড়া ২৫০ মিলি লিটার বৃষ্টিপাতেও ফলন ভালো হয়। খরায় এদের কোনো ক্ষতি হয় না, এমনকি বৃষ্টি ছাড়াও প্রায় ৮ মাস পর্যন্ত বাঁচতে পারে।

মাটি

ইপিল ইপিল সাধারণত দো-আঁশ জাতীয় মাটি, যেখানে পানি জমে থাকে না, সেখানে ভালো হয়। মাটির ক্ষারতা ৭.৫,অম্লতা ৬ এর মধ্যে থাকলে ফলন ভালো পাওয়া যাবে।

বীজ উৎপাদন

ইপিল ইপিলের ওপরের বীজের আবরণ বেশ শক্ত ও মোম জাতীয় আঠালো পদার্থ দিয়ে আবৃত। সেই জন্য অনেক সময় বীজের ভিতর পানি প্রবেশ করতে পারে না ও দেরিতে অঙ্কুরোদগম হয়। অনেক সময় অঙ্কুর ঠিক মতো বের হয় না। ভাল জাতের বীজ ৫ মিনিট পর্যন্ত ৮০ ডিগ্রি সেঃ গরম পানিতে রাখার পর ঠান্ডা পানিতে ধুয়ে শুকিয়ে চারা উৎপাদন করলে অঙ্কুরোদগম ভালো হয় এবং বীজ ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

চারা উৎপাদন ও চাষাবাদ

মার্চ-এপ্রিল (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ) মাসে বীজ বপন করা প্রয়োজন। প্রক্রিয়াজাত বীজ, বীজ তলায় ৫ সেন্টিমিটার অন্তর অন্তর প্রতিটি বীজ ১.২ থেকে ১.৫ সেন্টিমিটার মাটির নিচে পুঁতে দিতে হয়। জুলাই-আগস্ট (আষাঢ়-শ্রাবণ) মাসে চারা রোপণ করতে হয়। পলিথিনের ব্যাগেও চারা তৈরি করা যায়। মাটি ও গোবর সার (২ঃ ১ ভাগ) ভালোভাবে মিশিয়ে দুইটি করে বীজ পলিথিনের ২২ × ১০ সেন্টিমিটার ব্যাগে ১.৫ সেন্টিমিটার মাটির নিচে পুঁতে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে অথবা বছরের যে কোনো সময় চারা গাছ তৈরি করা যায়। গাছটিকে কখনো লিউকেনা নামে ডাকা হয়। গাছটির মধ্যে বহুগুণের সমারোহ বলেই জন্মস্থান মধ্য আমেরিকা থেকে আজ পৃথিবীর সমস্ত গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। পেরু, হাওয়াই এবং সালভাদরএ তিন জাতের মধ্যে পেরু জাতটি পশুখাদ্য হিসেবে বেশি ব্যবহার হচ্ছে। কারণ এটা ঝোঁপাকৃতির এবং কাঠের তুলনায় ডালপালা ও পাতা বেশি দেয়।

অন্য দু'টি কাঠ উৎপাদনে বেশি ব্যবহার হয়। আমাদের দেশে পেরু ও হাওয়াই দুপ্রকারের ইপিল ইপিল গাছই পাওয়া যায়।

অ্যালে পদ্ধতিতে চাষ

জমি ভালোভাবে চাষের পর আগাছামুক্ত করে গোবর সার (৩০০-৪০০ মণ/হেক্টর) দিলেই চাষের উপযুক্ত হবে। ১ মিঃ × ১ মিঃ দূরত্বে জমির লম্বায় অথবা প্রস্থে লাইন করে ইপিল ইপিল গাছ লাগানো যায়। ৩/৪ লাইনের পর ১০ ফুট পর্যন্ত ফাঁকা রেখে পুনরায় ৩/৪ লাইন ইপিল ইপিল লাগালে সহজে পরিচর্যা করা যায়। এ পদ্ধতিকে অ্যালে চাষ পদ্ধতি বলে। ফাঁকা জমিতে যে কেনো ফসল করা যায়। অ্যালে পদ্ধতিতে ইপিল ইপিল চাষ করা হলে একবার লাগানোর পর কমপক্ষে তিন বছর পর্যন্ত পশুখাদ্য হিসেবে গাছের ডগা ও পাতা ব্যবহার করা যায়। অ্যালে পদ্ধতিতে মাঝের প্রায় দশ ফুট জায়গা না রেখে পুরো জমিতে ইপিল ইপিল চাষকরা হলে আগাছা দমন, মাটি আলগা ইত্যাদি পরিচর্যার অভাবে পাতার ফলন হ্রাস পেতে পারে।

পশুখাদ্য সংগ্রহ

ইপিল ইপিল গাছ লাগানোর প্রথম বছরই ১.৫০ মিঃ উচ্চতায় একবার ডাল-পালাসহ পাতা সংগ্রহ করা যায়। পরবর্তী বছর থেকে একই উচ্চতায় বছরে কমপক্ষে চারবার কাটা যায়। শুষ্ক মৌসুমে সেচের সুবিধা থাকলে সেচ দেয়া যেতে পারে, তবে অত্যাবশ্যক নয়। উৎপাদন মাত্রা মাটির গুণাগুণ ও আবহাওয়ার ওপর নির্ভর করবে।

উৎপাদন

বছরের মে মাস হতে অক্টোবর পর্যন্ত প্রতি ৪৫ দিন (দেড় মাস) অন্তর ইপিল ইপিল পাতা ডগাসহ চার বার সংগ্রহ করা যায়। বাকি সময়ে কমপক্ষে একবার সংগ্রহ করা যায়। এভাবে সংগ্রহ করলে বছরে হেক্টর প্রতি ৪০ থেকে ৪৫ টন পশুখাদ্য উৎপন্ন হবে। এর মধ্যে ৩৫ থেকে ৪০ টনই পশুর নিকট গ্রহণযোগ্য এবং বাকি ৫ টন উচ্ছিষ্ট জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। ইপিল ইপিলই একমাত্র গুটি উৎপাদনকারী গাছ যা হেক্টরপ্রতি বছরে সর্বোচ্চ ২.১ টন আমিষ উৎপাদন করতে পারে। অন্যান্য ঘাস চাষের তুলনায় উৎপাদন খরচও অনেক কম।

ইপিল ইপিলের রোগ

লিইকেনা সাইলিড জাতীয় পোকাই ইপিল ইপিলের একমাত্র শত্রু। তবে বাংলাদেশে এখনো এটা দেখা যায়নি। সাইলিডে আক্রান্ত হলেও খুব অল্প সময়ে সাইলিড রোগ হতে মুক্ত হয়।

পশু খাদ্য হিসেবে ব্যবহার

ইপিল ইপিল গাছের ডালপালার নরম অংশে শতকরা ২৮-৩০ ভাগ শুষ্ক পদার্থ থাকে। উক্ত অংশের শুষ্ক পদার্থে শতকরা ৯০-৯২ ভাগ জৈব পদার্থ এবং ২৩-২৪ ভাগ আমিষ থাকে এবং ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অনুপাত থাকে প্রায় ১৫ঃ১। ঘাসটি খড় বা অন্যান্য অডাল জাতীয় ঘাসের সাথে মিশিয়ে খাওয়ালে ষাঁড় বাছুরের দৈহিক ওজন দৈনিক ৩০০ গ্রাম হারে বৃদ্ধি পায়। উক্ত মিশ্রণের সাথে শতকরা দশ ভাগ চিটাগুড় দিলে দৈহিক ওজন বৃদ্ধি ৪০০ গ্রামের ওপরে হবে।

ছাগলের জন্য ইপিল ইপিল একটি উন্নতমানের খাবার হিসেবে পরিচিত। ইপিল ইপিলের পাতা রোদে শুকিয়ে গরু বাছুরকে অন্যান্য খাদ্যের সাথে শতকরা ৪০-৫০ ভাগ হারে মিশিয়ে খাওয়ানো যেতে পারে।

সারণি ১ ঃ ইপিল ইপিল পশুখাদ্যের রাসায়নিক গঠন

সবুজ অবস্থায় শুষ্ক পদার্থ	জৈব পদার্থ (শুষ্ক পদার্থের ভিত্তিতে)	আমিষ (শুষ্ক পদার্থের ভিত্তিতে)	ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অনুপাত
২৮-৩০%	৯০-৯২%	২৩-২৪%	১৫ ঃ ১

সারণি ২ ঃ পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহার পদ্ধতি

খড় + ইপিল ইপিল	(ক) ১০০ কিলো + ৬০ কিলো (সর্বনিম্ন) (খ) ১০০ কিলো + ১৫০ কিলো (সর্বোচ্চ)
অডাল জাতীয় সবুজ ঘাস + ইপিল ইপিল	(ক) ১০০ কিলো + ২০ কিলো (সর্বনিম্ন) (খ) ১০০ কিলো + ৪৫ কিলো (সর্বোচ্চ)
অডাল জাতীয় সবুজ ঘাস + ইপিল ইপিল + চিটাগুড়	(ক) ১০০ কিলো + ২০ কিলো (সর্বনিম্ন) (খ) ১০০ কিলো + ৪৬ কিলো + ৪-৫ কিলো (সর্বোচ্চ)

সংরক্ষণ ব্যবস্থা

(ক) শুকিয়ে সংরক্ষণ

বৃষ্টির মৌসুমে ইপিল ইপিল খুব দ্রুত বাড়ে এবং প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করা যায়। এ সময়ে ইপিল ইপিলের পাতা রোদে শুকিয়ে চটের বস্তায় সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

(খ) সবুজ অবস্থায় সংরক্ষণ

নরম ডালপালাসহ পূর্বের নিয়মে কেটে মাটির গর্তে শুধু ইপিল ইপিল ঘাস সংরক্ষণ করা যায়। ইপিল ইপিল সবুজ ঘাস খড়ের সাথে মিশিয়েও মাটির গর্তে সংরক্ষণ করা যেতে পারে। প্রতি ১০০ কিলো সবুজ ঘাসের সাথে সর্বোচ্চ ১০ কিলো শুকনো খড় পরতে পরতে দিয়ে সংরক্ষণ করা যায়। এরূপ সংরক্ষণ পদ্ধতিতে চিটাগুড় ব্যবহৃত হয়। সংরক্ষণ পদ্ধতিটি বিএলআরআই, সাভার থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে। বৃষ্টির মৌসুমে এভাবে সংরক্ষণ করলে শুষ্ক মৌসুমে গর্ত থেকে তুলে গরুকে খাওয়ানো যায়।

বিষক্রিয়া

অনেক খামারি এমনকি সম্প্রসারণবিদগণের নিকট বড় আতঙ্ক হলো ইপিল ইপিল খাওয়ালে গরু বা

ছাগলের বিষক্রিয়া হয়। এ আতঙ্ক কৃষককে আজও এত উৎকৃষ্টমানের একটি পশুখাদ্য ব্যবহার হতে দূরে রেখেছে। অথচ গরুকে যথেচ্ছা পরিমাণ ইপিল ইপিল খাইয়েও অদ্যাবধি বিএলআরআইতে কোনো বিষক্রিয়ার আভাস পাওয়া যায়নি। আসলে গরু বা ছাগলকে দীর্ঘদিন খাওয়ালে ইপিল ইপিলের কোনো বিষক্রিয়া হয় না। গরু বা ছাগলের পেটে এক ধরনের জীবাণু জন্মায় যা ইপিল ইপিলের বিষ জাতীয় পদার্থ মাইমোসিনকে ভেঙে ডাইহাইড্রোক্সি পিরাডিন জাতীয় পদার্থে পরিণত করে যা মোটেই বিষাক্ত নয়। এজন্য প্রথম অবস্থায় গরু বা ছাগলকে অল্প অল্প করে খাওয়ানোর অভ্যাস করাতে হয়। পরে বেশি খাওয়ালেও কোনো সমস্যা হয় না। ইপিল ইপিল ঘাসটি বাংলাদেশের খামারিগণ পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে উপকৃত হবেন বলে আমরা আশা করি।

ঝুঁকির সম্ভবনা

গবাদিপশুকে প্রথমেই একক খাদ্য হিসেবে যথেচ্ছা পরিমাণ ইপিল ইপিল খাওয়ানো উচিত নয়। নতুন খাদ্য হিসেবে ধীরে ধীরে পশুকে অভ্যস্ত করতে হবে।

লাভের হার

উৎপাদন আয় ও ব্যয় ঃ প্রথম চাষের সময় হেক্টরপ্রতি ৫ হাজার টাকা খরচ হয় কিন্তু পরবর্তী বছরগুলোতে শুধুমাত্র ঘাস সংগ্রহের প্রযোজন হয়। উৎপাদন ব্যয় ও আয়ের (টাকা/হেক্টর/বছর) একটি হিসাব নিচের ছকে প্রদান করা হলো।

ব্যয়	১ বছর	২য় বছর	৩য় বছর
জমি চাষ	৫০০০.০০	-	-
অন্যান্য পরিচর্যা	৫০০০.০০	৫০০০.০০	৫০০০.০০
মোট ব্যয়	১০,০০০.০০	৫০০০.০০	৫০০০.০০
আয়	১ বছর	২য় বছর	৩য় বছর
পশু খাদ্য ৩৫.০ টন টাঃ ৫০০/ টন	৩৫০০.০০	১৭৫০০.০০	১৭৫০০.০০
জ্বালানি ৫.০ টন টাঃ ২০০০/ টন	২০০০.০০	১০০০০.০০	১০০০০.০০
মোট আয়	৫৫০০.০০	২৭৫০০.০০	২৭৫০০.০০
সর্ব মোট আয় =	৪৫০০.০০	২২৫০০.০০	২২৫০০.০০

উৎপাদন আয় ও ব্যয়ের হিসাবে ১৯৯৬ সনের বিধায় বর্তমানে পরিবর্তন হতে পারে।

পরিবেশের ওপর প্রতিক্রিয়া

প্রযুক্তিটি ব্যবহারের কারণে পরিবেশ দূষণের কোনো আশঙ্কা নেই। রবং বৃক্ষ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পরিবেশ সহায়ক ভূমিকা পালন করবে এবং পাশাপাশি মাটির স্বাস্থ্য সংরক্ষণে ভূমিকা পালন করবে।

উপসংহার ঃ একই জমি থেকে পশুখাদ্য ও জ্বালানি উৎপাদনে প্রযুক্তিটি ব্যবহারে খামারিবৃন্দ উপকৃত হবেন বলে আমরা আশা করি।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক ঃ ড. খান শহীদুল হক